নবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা ও তার প্রভাব

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-‘উসাইমীন রহ.

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মামুন

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

التمسك بالسنة النبوية وآثاره

« باللغة البنغالية »

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد صالح العثيمين

ترجمة: عبد الله المأمون

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

সুন্নতে নববীকে আঁকড়ে ধরা ও জীবনে এর প্রভাব

উপস্থাপকের কথা,

সব প্রশংসা মহান আল্লাহ তা‘আলার, দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। হে আল্লাহ আপনি তাঁর উপর রহমত ও শান্তি নাযিল করুন।

আজকের এ মহিমান্বিত রাতে আমরা সবাই সৌভাগ্যবান – আশা করি আপনারা সকলেও- যে, আমরা এক মহান আলেমের সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি তার মূল্যবান সময় ও ত্যাগ ইলম এবং তালিবে ইলমের খেদমতে দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে সাওয়াব ও প্রতিদান ছাড়া তিনি পার্থিব কোনো কিছু আশা করেন না। তিনি হলেন মহামান্য শাইখ মুহাম্মদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য, মসজিদে ‘উনাইযার ইমাম ও খতীব, প্রফেসর, ইমাম মুহাম্মদ ইবন স‘উদ আল-ইসলামিয়া, আল-কাসিম শাখা।

“সুন্নতে নববীকে আঁকড়ে ধরা ও জীবনে এর প্রভাব” সম্পর্কে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা প্রাঙ্গণে মদিনা উৎসব কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ১ম আলোচনা সভায় আমাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও দো‘আ কামনা করছি।

সম্মানিত পিতা শাইখ মুহাম্মদ ইবন সালিহ আল-‘উসাইমীনকে তার আলোচনা পেশ করার অনুরোধ করছি - আল্লাহ তার ও তার ইলমের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমকে উপকৃত করুন- । আলোচনা শেষে শাইখ মহোদয় লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিবেন। ধন্যবাদ।

সুন্নতে নববীকে আঁকড়ে ধরা ও জীবনে এর প্রভাব

সব প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, তাঁর কাছে আমাদের অন্তরের সব কলুষতা ও পাপ থেকে পানাহ চাই। তিনি যাকে হিদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথ-ভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হিদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, আর তিনি তাঁর রিসালা পৌঁছেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহর পথে যথাযথ প্রচেষ্টা করেছেন। তাই আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে যারা তাঁর অনুসরণ করবে সকলের উপর বর্ষিত হোক।

আজ বৃহস্পতিবার রাত, ১৯শে রজব ১৪১৯ হিজরী। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলরুমে মদিনাবাসী আমার ভাইবোনদের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমি আল্লাহর কাছে

প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের এ মিলনকে বরকতময় ও উপকারী করেন।

আজকের আলোচনার বিষয় হলো "সুন্নাহ তথা হাদীসে নববীকে আঁকড়ে ধরা ও জীবনে এর প্রভাব" যা আপনারা ইতোপূর্বেই শুনেছেন। বান্দাহর জন্য সুন্নাহ নববী কুরআনের মতই দলিল। তারা যেভাবে কুরআনের বিধান আমল করতে আদিষ্ট, সেভাবে হাদীসে নববীর উপরও আমল করতে আদিষ্ট।

সুন্নাহ নববী: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে সুন্নাহ নববী তথা হাদীস বলে। কুরআনের মত হাদীসের উপরও আমল করা ফরয; তবে পার্থক্য হলো কুরআনের দ্বারা দলিল পেশ করলে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় আর হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করলে দু'টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়।

আল-কুরআনের ক্ষেত্রে: দলিল পেশকারীকে দলিল প্রদানকারী নসের দালালাত তথা নসের নির্দেশকের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (কুরআনের ভাষ্যে কি বুঝানো হয়েছে তা ভালোভাবে জানতে হবে; আর এটা বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে তারতম্য লক্ষণীয়; কারণ) মানুষের ইলম ও জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে সব মানুষ এক স্তরের নয়। মানুষ তাদের ইলম, জ্ঞান, আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর সম্মান অনুধাবনের ভিন্নতার কারণে কুরআনের দালালাত (কী বুঝাতে চেয়েছেন তা) বুঝার ক্ষেত্রে নানা স্তরের হয়ে থাকে।

অন্যদিকে সুন্নাহের দ্বারা দলিল পেশকারীকে দু'টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়, সে দু'টি হলো:

প্রথমত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি সহীহভাবে সাব্যস্ত কিনা তা বিবেচনা করা; কেননা সুন্নাহের মধ্যে অনেক দ'য়ীফ (দুর্বল) ও মওদু'উ (জাল) হাদীস অনুপ্রবেশ করেছে, ফলে দলিল পেশকারীকে হাদীসটি সহীহ ও রাসূলের থেকে প্রমাণিত কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এজন্যই উলামা কিরামগণ রিজাল তথা হাদীসের রাবীদের অবস্থা বর্ণনায় অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এমনিভাবে মুসতালাহা (পরিভাষা) এর উপরও অনেক কিতাব লিখেছেন, যাতে দুর্বল থেকে সহীহ হাদীসটি আলাদা করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনের মতই খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ দালাতুন নসের (তথা হাদীসের ভাষ্যের চাহিদা কী সে) দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে মানুষ নানা ধরণের হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ﴾ [النساء: ١١٣]

"আল্লাহ আপনার উপর কিতাব (আল-কুরআন) ও হিকমাহ নাযিল করেছেন।" [সূরা নিসা:১১৩]

অধিকাংশ আলেম হিকমাহর তাফসির করেছেন সুন্নাহ বলে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴿٥٩﴾ ﴾ [النساء: ٥٩]

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।” [সূরা নিসা: ৫৯]

আর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়ায় তাঁর সুন্নাহ শরীয়তের দলিল হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যকীয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾ ﴾ [الجن: ٢٣]

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, যেখানে সে চিরদিন অবস্থান করবে।” [সূরা জীন: ২৩]

রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য শাস্তির বিধান সাব্যস্ত থাকায় প্রমাণিত হলো যে, সুন্নাহ অবশ্যই আল-কুরআনের মতই হুজ্জত (দলিল)। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ﴿٧﴾ ﴾ [الحشر: ٧]

“রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।” [সূরা হাশর: ৭]

যদিও এটা ফাই (যুদ্ধ ব্যতীত অর্জিত) সম্পদের বণ্টনের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাই এর মাল ইজতিহাদ করে বণ্টন করেছেন, তথাপিও আমাদেরকে এ বিধান গ্রহণ করা ওয়াজিব, আর শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে তো আরো বেশী অগ্রগণ্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١ ﴾ [الاحزاب: ٢١]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।” [সূরা আল-আহযাব: ২১]

রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণ বলতে বুঝায় দালালাতুল কুরআন (কুরআনের নস) মুতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব কাজ করেছেন ও তিনি নিজে যা সুন্নত করেছেন সে সব কাজ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম‘আর খুতবায়ে ঘোষণা করেছেন,

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ».

“অতঃপর উত্তম হাদীস (কথা) হলো আল্লাহর কিতাব, আর উত্তম হিদায়েত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েত।”[1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

“তোমরা আমার সুন্নত ও আমার পরে হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করো, এগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরো”[2]

এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস এসেছে।

কতিপয় দুর্ভাগা ও হতভাগারা বলে থাকে যে, “কুরআনে যা আছে শুধু তার উপরই আমল করতে হবে”। অথচ তারা নিজেরাই এর বিপরীত আমল করে থাকে। যেমন: যখন তারা বলে “শুধু কুরআনে যা আছে তাই মানতে হবে” তখন তাদেরকে বলা হবে, কুরআনই রাসূলের অনুসরণ করা ওয়াজিব করেছে। তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তবে অবশ্যই তোমাকে হাদীসে যে সব বিধান এসেছে তা গ্রহণ করতে হবে।

---

[1] মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৭।

2 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের লোকদের সম্পর্কে আগেই সতর্ক করেছেন, তিনি বলেছেন:

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি যেন তোমাদের মাঝে কাউকে এমন না পাই যে, সে তার খাটের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর আমি যা আদেশ দিয়েছি বা যা থেকে নিষেধ করছি তা তার কাছে পৌঁছলে সে তখন বলবে: এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি তারই অনুসরণ করি" জেনে রাখো, নিশ্চয় আমাকে কুরআন ও এর অনুরূপ একটি কিতাব (সুন্নাহ) দেয়া হয়েছে।[1]

এছাড়া কুরআনের অনেক আয়াত মুজমাল (ব্যাখ্যা বিশ্লেষণহীন) যা হাদীস ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহলে যদি আমরা বলি হাদীস গ্রহণ করা যাবে না তাহলে তো কুরআনের মুজমাল আয়াতের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। আর এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। এজন্যই আমরা বলব, ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ বা হারাম

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৪ ও ৪৬০৫।

সাব্যস্তের ক্ষেত্রে রাসূলের হাদীসের উপর কুরআনের মতই আমল করা ওয়াজিব।

সালাফে সালেহীনরা রাসূলের সুন্নতের উপর আমল করতেন, এ ব্যাপারে তারা কোনো ধরনের ত্রুটি করতেন না, ছাড়ও দিতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ আসলে আল্লাহ তা'আলার আদেশের মতই তারা তা গ্রহণ করতেন। সাহাবা কিরামদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো আদেশ দিলে তারা জিজ্ঞেস করতেন না এটা কি ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব? কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তারা তা পালন করতেন। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ শুনলে জিজ্ঞেস করে "এটা কি ফরয নাকি মুস্তাহাব?" সুবহানাল্লাহ!! কিভাবে এটা সম্ভব? কিভাবে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা তালাশ করি?! অথচ আল্লাহ তা 'আলা বলেছেন:

﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ۝٥٩ ﴾ [النساء: ٥٩]

"তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার উলিল আমরের অনুগত্য কর।" [সূরা নিসা: ৫৯]

তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন কর। যদি তা ফরযের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তুমি তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলে, আর যদি মুস্তাহাব হয় তবে সাওয়াবের অধিকারী হবে।

কেউ একথা বলতে পারবে না যে, সাহাবাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো আদেশ দিলে তারা জিজ্ঞেস করেছেন যে, এটা কি ফরয নাকি মুস্তাহাব? তবে হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কিছু ইঙ্গিত দিলে তারা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। যেমন: বারীরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস, তিনি দাসী ছিলেন। মুগীস নামে একজন তাকে বিয়ে করেছিলেন। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাকে আযাদ করেন। তিনি আযাদ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পূর্বের স্বামীর সাথে বহাল থাকা বা সে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ইখতিয়ার দেন। ফলে তিনি বিয়ে বিচ্ছেদের মত দেন। কিন্তু তার স্বামী তার সাথে সম্পর্ক রাখতে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং মদিনার বাজারে তাকে অনুসরণ করতে থাকেন ও কাঁদতে থাকেন, যাতে স্ত্রী তার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে। কিন্তু তিনি ফিরে আসতে অস্বীকার করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পূর্বের স্বামী মুগীসের কাছে যেতে বললেন। তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আমাকে আদেশ করেন তবে তা শিরোধার্য। আর যদি আপনি আমাকে পরামর্শ দেন তবে আমার এ বিয়েতে মত নেই। এখানে সাহাবী প্রশ্ন করেছেন যে, যদি রাসূলের এ কথাটি আদেশসূচক হয় তবে তা তিনি পালন করবেন। আর যদি তা পরামর্শ হয় তবে তা

তিনি ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন বা নাও গ্রহণ করতে পারেন।

মূলকথা হলো: আমি তালিবে ইলমকে অনুরোধ করবো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো আদেশ আসলে তা কোনো ব্যাখ্যা চাওয়া ব্যতীতই গ্রহণ করা। আল্লাহ তা 'আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ ﴾ [النور: ٥١]

"মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহবান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" [সূরা আন-নূর: ৫১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٖ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْۗ ٣٦ ﴾ [الاحزاب: ٣٦]

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না।" [সূরা আল-আহযাব: ৩৬]

তবে হ্যাঁ, যখন কোনো মু'মিনের তরফ থেকে এর বিপরীত কিছু ঘটে যাবে তখন দেখা হবে সেটা কি ওয়াজিব ছিল? কেননা ওয়াজিব তরক করলে তাকে তাওবা করতে হবে। আর যদি তা মুস্তাহাব হয়

তবে সে ব্যাপারটা একটু হালকা। কিন্তু আল্লাহর আদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে তোমার অন্তরকে প্রশস্ত করো। তুমি বলো: ﴿ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ ﴾ [النور: ٥١]"'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" [সূরা আন-নূর: ৫১] তুমি তা করো। আর এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্যকারী একজন মানুষের করা উচিত।

নসের অর্থ, শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যনীয় ক্বারিনা (আলামত) বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; যাতে ভুলে পতিত না হয়। কেননা কিছু মানুষ আছে যারা রাসূলের অনুসরণের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, কিন্তু সে কাজটি সঠিক ভেবে করে, প্রকৃতপক্ষে কাজটি সঠিক নয়। **এর অনেক উদাহরণ আছে।** যেমন:

কিছু মানুষ নামাযে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ শেষে দাঁড়ানোর সময় বসা অবস্থায়ই দু'হাত উঠায়, তারা মনে করেন এটা করা সুন্নত। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সুন্নত হলো শুধু দাঁড়ানো অবস্থায়ই দু'হাত উঠানো। যেমন, এ ব্যাপারে বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে।[1]

এর আর একটি উদাহরণ হলো: কিছু মানুষ সাহাবীর নিম্নোক্ত কথা ভুল বুঝে, তা হলো:

---

[1] বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব রফউল ইয়াদাইন ফি তাকবিরাতুল উলা মা'আল ইফতিতাহ, হাদীস নং ৭৩৫।

"كان أحدنا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ "

"আমাদের একজন পায়ের গোড়ালি তার পাশের জনের পায়ের গোড়ালির সাথে ও কাঁধ কাঁধের সাথে মিলিয়ে দাঁড়াত"। অর্থাৎ নামাযে এমনভাবে পা সম্প্রসারিত করে দাঁড়াত যে, একজনের গোড়ালি অন্যের সাথে মিলে থাকত। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা এমন নয়। বরং সাহাবীর কথার অর্থ হলো, তারা কাতারে এমনভাবে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াতেন যেন পায়ের গোড়ালির সাহায্যে কাতার সোজা করেছেন। ফলে একজন অন্যের সামনে পিছনে যেতেন না। পক্ষান্তরে তারা যদি তাদের পা সম্প্রসারিত করে দাঁড়াতেন তবে সাহাবী বলতেন, তারা পা মেলে দাঁড়াতেন। একথা সবাই জানে যে, কেউ পা মেলে দাঁড়ালে অন্যের কাঁধের থেকে তার কাঁধের দূরত্ব বেড়ে যায়। মূল কথা হলো, নসের অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে।

রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ জীবনে অনেক সুপ্রভাব রয়েছে। সেগুলো হলো:

মানুষ বুঝবে যে, সে একজন ইমামের অনুসরণ করছে, আর তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন তার অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা জন্ম হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যা, দু'ব্যক্তি সুন্নত অনুযায়ী অযু করল, কিন্তু একজন অযুর সময় অনুভব করল যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অনুসারী, অযুর সময় সে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে দেখে অযু করছেন, আর অন্যজন এ অনুভব না করে গাফিল থাকল। ফলে প্রথম ব্যক্তির অন্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে অনেক প্রভাব থাকবে। প্রথম ব্যক্তি ভাববে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, তাঁর মতই কাজ করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস অনুযায়ী সাওয়াবের অধিকারী হবে:

«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি আমার মত অযু করবে অতঃপর দু'রাক'আত নামায পড়বে, এর মধ্যে (অযু ও নামাযের) অপবিত্র হবে না, আল্লাহ তা'আলা তার সব গুনাহ মাফ করে দিবেন।"[1]

এভাবে অনেক মুসলিম নামাযে রাসূলের সুন্নতের তালাশ করেন, যদিও সুন্নত অনুযায়ী আমল করে কিন্তু তাদের মন থেকে একথা ভুলে যায় যে, তারা সব কাজে ও কথায় রাসূলের অনুসরণ করে। আর এটা হয় অসতর্ক থাকার কারণে। কিন্তু মানুষ যদি নামাযে এ অনুভব করে যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করছে, সে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[1] বুখারী, হাদীস নং ১৬০।

ওয়াসাল্লামকে দেখে দেখে আমল করছে, তাহলে তার অন্তরে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে।

আরো জেনে রাখা দরকার যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরলে বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْر الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا»

“সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হিদায়েত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েত এবং সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার”.[1]

এখানে নতুন অবিষ্কারকে সুন্নতের বিপরীত বলা হয়েছে। ফলে মানুষ যতই সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে ততই বিদ‘আত থেকে দূরে থাকবে। এভাবেই সে বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ তা‘আলা যা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা ব্যতীত বান্দা ইবাদত করতে পারে না। কেননা সে সুন্নতের অনুসারী। এতে অনেক ফল রয়েছে। তা হলো: বিদ‘আতকে নিঃশেষ করা, কেননা সে সুন্নতের অনুসারী। আর বিদ‘আতকে নিঃশেষ ও অপছন্দ করা বান্দার উপর মহান আল্লাহ তা‘আলার অশেষ নিয়ামত। বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যান করা শির্ককে প্রত্যাখ্যান করার মতই। কেননা শির্ক মুক্ত হয়ে সহীহ

---

1 ইবন মাযাহ, হাদীস নং ৪৫।

ইখলাছ ও বিদ‘আত মুক্ত সঠিক অনুসরণ ব্যতীত ইবাদত কবুল হয় না।

সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা ও এর প্রশংসনীয় প্রভাবের আরো ফায়েদা হলো: সুন্নতের অনুসরণ তার জন্য আদর্শ হবে ও এটাই তার ইমাম হবে। এতে কোনো ঘাটতি অনুপ্রবেশ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি অন্য মুসলিম ইমামের অনুসরণ করে ইবাদত করে, এতে কিছু ঘাটতি ঘটতে পারে। সহজেই তাকে বলা যায় যে, এ আমলে তোমার দলিল কি? কিন্তু সুন্নতের অনুসরণে এ ধরণের কিছু হয় না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে: তোমার দলিল কি? সে তখন বলবে, “এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ”, যদি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সে বলবে, “এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী”। এতে করে সে দুর্গম কেল্লায় প্রবেশ করল, কেননা সে সুন্নতে হামীদার বা প্রশংসনীয় পদ্ধতির প্রাচীরে প্রবেশ করেছে।

সুন্নতে হামীদার আর একটি ফায়েদা হলো: এর দ্বারা মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাককে ধারণ করে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম চরিত্রকে পূর্ণ করতে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাকে সর্বোত্তম চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানূষ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সুন্নতের অনুসরণ করবে তখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে চরিত্রবান হবে এবং এটা তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে নিকটবর্তী করবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا »

“ঈমানদারদের মধ্যে সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার যে চরিত্রে সর্বোত্তম।”[1]

সুন্নতে মুতাহহারার অনুসরণের আরেকটি উপকার হলো: মানুষ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অতি বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি বাদ দিয়ে মধ্যপন্থা অনুসরণকারী হবে। ইসলাম ধর্ম হলো মধ্যপন্থী ধর্ম, এতে অতি বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি নেই। বরং তারা এ দুয়ের মাঝামাঝি। তাই সুন্নতের অনুসরণ হলো আল্লাহর পথে অতি বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি না করে সব কিছু তার নিজস্ব স্থানে রেখে সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা।

আমি এখানে দু’টি উদাহরণ পেশ করব, তা হলো:

প্রথম উদাহরণ: অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে তার অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করা।

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ৪৬৮২।

দ্বিতীয় উদাহরণ: জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত কাজ সম্পাদনকারীর সাথে তার অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করা।

প্রথম উদাহরণে বলা যায় যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে (মসজিদে নববী) ঢুকল এবং মসজিদের এক পাশে গিয়ে পেশাব করতে লাগল। সাহাবাগণ তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করল এবং তারা জোরে জোরে ডাকাডাকি করতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা লোকটিকে পেশাব করতে বারণ করো না, তাকে পেশাব করতে দাও। অথচ বেশী পেশাব করা মসজিদ বেশী অপবিত্র করা। কিন্তু এ কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত ছিল যা সাহাবারা বুঝতে পারেন নি। ফলে বেদুঈন লোকটি পেশাব শেষ করল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন লোকটির পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দিতে। ফলে মসজিদ থেকে ময়লা দূর হলো এবং পবিত্র হয়ে গেল। আর বেদুঈন লোকটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন:

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

"মসজিদসমূহে কষ্টদায়ক ও অপবিত্রকর কিছু করা উচিত নয়, এগুলো নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের স্থান"।[1] বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যেভাবে বলেছেন। একথা শুনে বেদুঈন লোকটি বলল: "ইয়া আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মদকে দয়া করো, আমাদের সাথে কাউকে দয়া করো না"।

দেখুন কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ লোকটির সাথে আচরণ করেছেন। তাই রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ তার কাজের মত কাজ করারই নামান্তর। অজ্ঞকে ধমক, ভর্ৎসনা বা দোষারোপ না করে তার সাথে হিকমতের সাথে কাজ করা।

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে সোনার আংটি পরিধান করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পবিত্র হাতে আংটিটি খুলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন:

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»

"কেউ কি ইচ্ছাকৃতভাবে আগুনের এক টুকরা পাথর নিয়ে হাতে পরিধান করবে?

সুতরাং এখানে এ ব্যক্তি ও উক্ত বেদুঈন ব্যক্তির সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণগত পার্থক্য দেখেছেন।

---

[1] বুখারী, হাদীস নং ৬০২৫।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলে তাকে বলা হলো: তুমি তোমার আংটিটি নাও। সে বলল: “আল্লাহর কসম, যে আংটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়েছেন সে আংটি আমি নিবো না”।[1]

সুন্নতের অনুসরণ ব্যক্তিকে রহমত, ভালবাসা, নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথে আনন্দ-মজা করতেন। তাদের ভুল ত্রুটির উপর তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন। যেমন তিনি এক বালকের সাথে মজা করেছেন, যার কাছে “নুগায়ের” নামে একটি পাখি ছিল। সে পাখিটির সাথে খেলা ও আনন্দ করতেন। যেমনটি অন্যান্য শিশুরা করে থাকে। পাখিটি মারা গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজা করে তাকে বললেন: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» “হে আবু ‘উমায়ের, তোমার নুগায়েরের কি হলো?”[2] এটা তার সাথে রাসূলের ভালবাসা ও মজা ছিল।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তাঁর সিজদারত অবস্থায় হাসান ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এসে পিঠে চড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে উঠতে বিলম্ব করলেন। অতঃপর যখন রাসূল সালাম ফিরালেন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে জানালেন যে,

---

[1] মুসলিম, হাদীস নং ২০৯০।

2 বুখারী, হাদীস নং ২১৫০।

তাঁর ছেলে (নাতি) তাকে বাহন বানিয়েছিল, আর তিনি চাইলেন যে, তাকে সেভাবে রাখবেন যতক্ষণ না সে তার ইচ্ছা পূর্ণ করে (আর তাই সাজদায় দেরী করেছিলেন)। হে আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম পেশ করুন, আমাদের কেউ কি এমন কিছু করবে? সে মনে করবে যদি সে এমনটি করে তবে বহু মানুষ তার সমালোচনা করবে, অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করেছেন। তিনি তা করেছেন শিশুদের সাথে প্রতি রহম ও তাদেরকে খুশী করতে। আমাদের অনেকেই শিশুদেরকে ভালবাসে না। তাদের প্রতি দয়া দেখায় না; বরং ধমক দেয়, এমনকি কোনো শিশু আদব সহকারে মজলিসে আসলেও ধমক দেয়। আর বলে: "তুমি তোমার বাড়ি চলে যাও"। বা অনুরূপ কথা বলে। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি এমনটি করলে কেন? তখন সে উত্তর দেয় যে, "হয়ত সে বয়স্কদের পথে ঢুকে খেলাধুলা করবে"। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١ ﴾ [الاحزاب: ٢١]

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" [সূরা আল-আহযাব: ২১]

অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে অনেক সুপ্রভাব আছে। কিন্তু এগুলো সুন্নত সম্পর্কে ইলম অর্জন করাকে অত্যাবশ্যকীয় করে। এজন্যই আমি তালিবে ইলম ভাই বোনদেরকে বলব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত জানা ও আমল করার চেষ্টা করো। আর মানুষকে একাজে ডাকো, কেননা এতে রয়েছে স্থায়ী কল্যাণ।

আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছি যে, সুন্নতের অনুসরণ বিদ‘আতকে ঘৃণা করা, একে নিঃশেষ করা ও এ থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যকীয় করে। এ উপলক্ষ্যে বলব, আমরা এখন হারাম মাস তথা **রজব মাসে** আছি। এ মাসের আমল নিয়ে আমি কিছু বিষয় লিখেছি যা আল্লাহ আমাকে লিখতে তাওফিক দিয়েছেন। সেগুলো এখন আপনাদের কাছে পাঠ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আশা করি এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে উপকৃত করবেন।

১- রজব মাস হারামকৃত চার মাসের একটি। সেগুলো হলো: যুল-কা‘আদা, যুল-হিজ্জা, মুহাররম, লাগাতার এ তিন মাস একসাথে ও জামাদিউস সানী ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী রজব মাস। এ চার মাসের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন এ চার মাসের মধ্যে কোনটি উত্তম? কতিপয় শাফে‘য়ী বলেছেন, রজব মাস উত্তম। তবে ইমাম নাওয়াবী ও অন্যান্যরা এ মতকে দুর্বল বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মুহাররম মাস। ইমাম হাসান এ

মতের কথক, ইমাম নাওয়াবী এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যুল-হাজ্জ্ব মাস। সাঈদ ইবন জুবাইর ও অন্যান্য এটা বলেছেন। এটাই বেশী গ্রহণযোগ্য। ‘‘আল-লাতা-য়িফ’’ গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ আছে। আমার মতে, যুল-হাজ্জ্ব মাসই সর্বোত্তম। কেননা এ মাসের দু’টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হলো: এটি হাজ্জ্বে মাস, এতে হাজ্জ্বে আকবরের দিন রয়েছে, আর অন্যটি হলো এটি হারামকৃত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত।

২- রজব মাসকে জাহেলী যুগে লোকজন অনেক সম্মান করত। অন্যান্য হারাম মাসের মতো এ মাসে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম মনে করত।

আলেমগণ এ মাসে যুদ্ধ হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। অধিকাংশের মতে, যুদ্ধ হারাম হওয়ার বিধান মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। এ মাসে ও অন্য সব হামারকৃত মাসে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয। ‘উমুমে আদিল্লা (সাধারণ দলিল প্রমাণ) এর কারণে তারা এ মত দিয়েছেন।

তবে সহীহ কথা হলো, এ মাসে যুদ্ধ শুরু করা হারাম। আর যদি কাফিররা যুদ্ধ শুরু করে অথবা হারাম মাসে পূর্ব থেকে যুদ্ধ চলছিল তবে যুদ্ধ করতে কোনো অসুবিধে নেই।

৩- রজব মাসে জাহেলী যুগের লোকেরা সাওম পালন করে সম্মান প্রদর্শন করত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ মাসে বিশেষ কোনো সাওমের বিধান পাওয়া যায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহ. বলেছেন: "রজব মাসে সাওম পালনের সব হাদীস দুর্বল। বরং মউদু' (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মিথ্যাচার)। আহলে ইলমদের কাছে এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এগুলো এমন দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্তও না যেগুলো ফযিলতের ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়, বরং সব গুলো মুউদু' ও মিথ্যা হাদীস।"[1]

এমনকি তিনি আরো বলেছেন, "যারা রজব মাসে খাবার-পানীয় থেকে বিরত থাকতেন তাদেরকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রহার করতেন। তিনি বলতেন: তোমরা রজব মাসকে রমযান মাসের মত করো না"।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তার পরিবারের লোকজন রজব মাসে সাওম পালনের জন্য পানির পাত্র কিনেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কি? তারা বলল, রজব মাস। তিনি বললেন: তোমরা কি এটাকে রমাদানের সাথে সাদৃশ্য করবে? তিনি সে পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেললেন।

---

1 ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়া: ২৫/২৯০।

হাফেয ইবন রজব “আল-লাতা-য়িফ” গ্রন্থে (ইবন তাইমিয়্যাহ এর) “আল-ফাতাওয়া” গ্রন্থের মতই উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উক্ত বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো সংযোগ করেছেন যে, জাহেলী যুগের মানুষ রজব মাসকে সম্মান করত। ইসলামের আগমন হলে এটা বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪- আরবরা রজব মাসকে সম্মান করত। এ মাসে তারা উমরা পালন করত। কেননা যিল-হাজ্জ্ব মাসে তারা বাইতুল্লাহর হজ্জ্ব করত। আর মুহাররম থেকে রজব হলো মধ্য বছর। তাই তারা এ মাসে উমরা করত আর বছরের শেষে যুল-হাজ্জ্বে হজ্জ্ব করত।

হাফেয ইবন রজব “আল-লাতা-য়িফ” গ্রন্থে আরো বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রজব মাসে উমরা পালন করা মুস্তাহাব মনে করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ও ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ মাসে উমরা করতেন। ইবন সীরীন সালাফদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এ মাসে উমরা পালন করতেন।

৫- রজব মাসে “আর-রাগা-য়েব” নামে নামায আছে (বলে বলা হয়)। প্রথম জুমাবার মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময় এ নামায পড়তে হয়। বারো রাকাত নামায। হাফেয ইবন হাজার “তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওরাদা ফি ফদলে রজব” কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নাওয়াবী “শরহে আল-মুহাযযাব” কিতাবে বলেছেন, “আর-রাগায়ীব” নামের সালাত বারো রাকাত, যা মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময় রজব মাসের প্রথম জুমাবারে পড়তে হয়, আর শা‘বানের মধ্যরাতে একশত রাকাত নামায”।[1]

এ দু’ধরণের নামায পড়া বিদ‘আত, নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ। “ক্বুওতুল ক্বুলূব” ও “ইহইয়া ‘উলুমুদ্দিন” কিতাবে এর উল্লেখ থাকায় কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে। কেননা এটা বিদ‘আত। কাউকে এ ধোঁকায়ও যেন না ফেলে যে, কোনো কোনো ইমাম এর হুকুম অন্য নামাযের সাথে কিয়াস করে দিয়ে থাকেন, ফলে তারা একে মুস্তাহাব বলেছেন; কেননা স্পষ্ট ভুল।

ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুররহমান ইবন ইসমাঈল আল-মাক্বদিসী এ ব্যাপারে একটি মূল্যবান কিতাব লিখেছেন। তিনি এতে চমৎকারভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) “মাজমু‘উল ফাতাওয়া” (২৩/১২৪) কিতাবে বলেছেন, “উলামা কিরামের ঐকমত্যে “সালাতুর-রাগায়েব” বিদ‘আত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর খলিফাগণ এটার প্রচলন করেন নি। দ্বীনের কোনো ইমাম যথা: ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, আবু হানিফা,

---

1 শরহে মুহাযযাব: ৩/৫৪৮

ছাওরী, আওঝায়ী, লাইস প্রমুখ কোনো ইমাম একে মুস্তাহাব বলেননি। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সবগুলো হাদীসবিদদের ঐকমত্যে মিথ্যা হাদীস"।

ইবন রজব "আল-লাতা-য়িফ" কিতাবে বলেছনে, "রজব মাসে কোনো নির্দিষ্ট নামায নেই। রজবের প্রথম জুম্মাবারের রাতে "সালাতুর-রাগায়েব" নামে নামায সম্পর্কে বর্ণিত সব হাদীস মিথ্যা, বাতিল ও ভিত্তিহীন"।

তিনি আরো বলেছেন, "পূর্ববর্তী কোনো আলেম থেকে এর বর্ণনা পাওয়া যায়না, এটা তাদের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। হিজরী চতুর্থ শতাব্দির পরে এটা প্রথম প্রকাশ পেয়েছে; এজন্যই মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী মনিষীগণ এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না ও এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি"।

শাওকানী "আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমু'আ" (পৃ:৪৮) কিতাবে বলেছেন, "সব হাফিযগণ (হাদীসবিদ) এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, "সালাতুর-রাগায়েব" মওদু' তথা মানুষের বানানো", এমনকি তিনি আরো বলেছেন, "হাদীস সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে সে জানে যে, এটা মওদু' তথা মানুষের বানানো"। তিনি আরো বলেছেন, "ফাইরোযাবাদী" তার "আল-মুখতাসার" কিতাবে বলেছেন: সকলের ঐকমত্যে এ নামায বানোয়াট", "আল-মাক্বদিসী'ও এ কথা বলেছেন"।

শাওক্কানী উপরোক্ত কিতাবে রজবের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতের নামাযের ফযিলত সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, “এটা জুওযাক্কানী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটা মাউদু‘ তথা বানোয়াট এবং এর সব রাবী অজ্ঞাত”।

৫- রজব মাসে কিছু লোক মদিনায় গিয়ে “আর-রজবীয়া” নামে বিশেষ এক ধরণের যিয়ারত করত। তারা মনে করত, এ ধরণের যিয়ারত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তারা কতিপয় স্থান যিয়ারত করত, তন্মধ্যে কিছু স্থান যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত, যেমন: মসজিদে নববী, মসজিদে ক্কুবা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, তাঁর দু’সাহাবীর কবর, জান্নাতুল বাকী ও ওহুদ যুদ্ধে নিহত শহীদদের কবর যিয়ারত।

আবার তারা এমন কিছু স্থান যিয়ারত করত যা শরীয়তসম্মত নয়, যেমন: মসজিদে গামামা, মসজিদে যুল-ক্বিল্লাতাইন ও সাত মসজিদ যিয়ারত। “আর-রজবীয়া” নামের এ যিয়ারত আহলে ইলমের কাছে কোনো ভিত্তি নেই। এটা বিদ‘আত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মসজিদে নববী হলো সে সব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত যেসব মসজিদ যিয়ারত শরীয়তসম্মত। সেগুলো হলো: মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্বসা। কিন্তু এ সব মসজিদে নির্দিষ্ট কোনো

মাসে বা দিনে যিয়ারত করলে দলীলের প্রয়োজন। অথচ রজব মাসে নির্দিষ্ট সময় এ সব স্থানে যিয়ারতের কোনো দলিল নেই।

অতএব, আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় রজব মাসের নির্দিষ্ট সময় যিয়ারত করা বিদ‘আত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“যে আমাদের শরীয়ত বহির্ভূত কোনো কাজ করবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে”।[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেউ আমাদের এ শরীয়তে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে”।[2]

৬- মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তী কারো কারো মতে, রজব মাসের সাতাশ তারিখে ইসরা ও মি‘রাজ সংঘটিত হয়েছিল। এ তারিখে তারা অনুষ্ঠান করত। এ দিনটিতে তারা সরকারী ছুটি কাটাতো।

---

[1] মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

[2] বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭।

কিন্তু এ দিনে ইসরা ও মি‘রাজ সংঘটিত হলে দু’টি জিনিস প্রমাণ করতে হবে:

প্রথমত: ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

দ্বিতীয়ত: ইবাদত ভেবে অনুষ্ঠান করা।

এ মাসে ইসরা ও মি‘রাজ হওয়ার ব্যাপারে ‘উলামা কিরাম মতানৈক্য করেছেন:

ইবন কাসীর “আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া” (৩/১১৯) কিতাবে বলেছেন: যুহরী ও ‘উরওয়াহ বলেন, “ইসরা ও মি‘রাজ হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা যাওয়ার এক বছর আগে”। তাই এটা রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হিজরতের ষোল মাস পূর্বে হয়েছিল, ফলে যুল-ক্বাদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

হাফেয আব্দুল গনী ইবন সুরুর আল-মাক্বদিসী তার সীরাত গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা সহীহ নয়: “ইসরা ও মি‘রাজ রজব মাসের সাতাশ সংঘটিত হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন, এটা রজবের প্রথম জুম্মা বারের রজনীতে অর্থাৎ ‘আররগায়েব’ এর রাতে সংঘটিত হয়েছিল। এটা মানুষের মাঝে বহুল প্রচলিত বিদ‘আত, এর কোনো ভিত্তি নেই”।

আস-সাফফারিনী তার “শরহে আক্বীদা” (২/২৮০) গ্রন্থে বলেছেন: ওয়াক্বেদী তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, “ইসরা ও মি‘রাজ নবুয়াতের

দ্বাদশ সনে সতেরোই রমযান, শনিবার সংঘটিত হয়েছিল, যা হিজরতের আঠারো মাস পূর্বে ছিল। তিনি তার শাইখদের থেকে আরো বর্ণনা করেন, রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের এক বছর পূর্বে রবিউল আউয়াল মাসের সতেরো তারিখ রাতে ইসরা ও মি'রাজে নেওয়া হয়েছিল। আবু মুহাম্মদ ইবন হাযাম এমতের উপর ইজমা দাবী করেছেন। এটা ইবন আব্বাস ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মত।"

অতঃপর তিনি ইবন জাওযী রহ. এর মত উল্লেখ করেছেন: "এটা রবিউল আউয়াল বা রজব বা রমাদান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।"

হাফেয ইবন হাজার "ফাতহুল বারী" (৭/২০৩) গ্রন্থে সহীহ বুখারীর মি'রাজ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: "ইসরা ও মি'রাজের ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরাম মতানৈক্য করেছেন, যা দশটিরও অধিক। তন্মধ্য থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন, এটা হিজরতের এক বছর পূর্বে হয়েছিল। এ মতটি ইবন সা'দ ও অন্যান্যরা বলেছেন। ইমাম নাওয়াবী এমতে খুব জোর দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হিজরতের আট মাস পূর্বে, বা এক বছর, বা এগারো মাস, বা এক বছর দু'মাস, বা এক বছর তিন মাস, বা এক বছর পাঁচ মাস, বা আঠারো মাস, বা তিন বছর বা পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইসরা ও মি'রাজ রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল, এ মতটি ইবন আব্দুল বার বলেছেন, নাওয়াবী "আর-

রাওদা” কিতাবে এ মতকে শক্তিশালী বলেছেন।” কিন্তু অনেকেই বলেছেন, “আর-রাওদা” কিতাবে নাওয়াবীর এ কথা পাওয়া যায় না। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহ. থেকে তার ছাত্র ইবনুল কাইয়ুম “যাদুল মা‘আদ” কিতাবে কতিপয় দিন, মাস ইত্যাদির মর্যাদা অধ্যয়ে যা উল্লেখ করেছেন তার জবাবে শাইখ (ইবন তাইমিয়াহ) বলেছেন: অতঃপর লেখক এখানে যে রাতে ইসরা (ও মি‘রাজ) সংঘটিত হয়েছিল সে রাতের মর্যাদা লাইলাতুল ক্বদরের চেয়ে উত্তম বলেছেন; যদি তিনি রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে রাতে ইসরা করানো হয়েছিল সে রাতকে সাধারণভাবে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য লাইলাতুল ক্বদরের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান মনে করেন এবং এ রাতে সালাত আদায় ও দু‘আ করা ক্বদরের চেয়েও উত্তম মনে করেন তাহলে তা বাতিল। মুসলিম কোনো ইমামই এ কথা বলেননি। এটা দ্বীন ইসলামে ফাসাদের ধারাবাহিকতার ফলাফল। তাও যদি ইসরার রাত নির্দিষ্ট ভাবে জানা যেত। অথচ ইসরার মাস, দিন বা দশক নির্দিষ্টভাবে কোনটাই জানা যায় নি; বরং এর রেয়াওয়াত মুনকাতি‘ ও নানারূপ। এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল নেই। মুসলিমদের জন্য ইসরার রাত্রিতে নির্দিষ্ট কোনো নামায বা ইবাদতের বিধান নেই”।

এমনকি তিনি এটাও বলেছেন: এ কথা পাওয়া যায় না যে, মুসলিমদের কেউ ইসরার রাত্রিকে অন্যান্য রাত্রি অপেক্ষা ফযিলতপূর্ণ

বলেছেন। বিশেষ করে লাইলাতুল ক্বদরের রাত্রির তুলনায়। সাহাবা ও তাবেয়ীরা এ রাতে বিশেষ কোনো আমল করেছেন বলে পাওয়া যায় না। তারা এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি, এজন্যই এটি নির্দিষ্টভাবে কোনো রাতে তাও জানা যায় না”।

এ সব কিছু ইসরা ও মি‘রাজের রাত নির্ধারণে ঐতিহাসিক দিক। আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসরা ও মি‘রাজের রাত, মাস বা বছর নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না।

দ্বিতীয়ত: ইসরা ও মি‘রাজের রাতকে ঈদের রাত মনে করা এবং এতে অনুষ্ঠান করা, আলোচনা করা এবং ইসরা ও মি‘রাজ সম্পর্কে মউদু‘ ও দ‘য়ীফ (বানোয়াট ও দুর্বল) হাদীস বর্ণনা ইত্যাদি পালন করা যে দীনে ইসলামে নতুন আবিষ্কার তথা বিদ‘আত এতে কেউ সন্দেহ করতে পারে না, যদি সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত থাকে এবং এর বাস্তব অবস্থা জানে। কেননা এ রাতে কোনো অনুষ্ঠান সাহাবা বা তাবে‘য়ীদের যুগে প্রচলন ছিল না। ইসলামে তিনটি ঈদ ছাড়া কোনো ঈদ নেই, তা হলো: ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও জুম্মার দিন, এটা সাপ্তাহিক ঈদ। এ তিনটি ঈদ ছাড়া আর কোনো ঈদ ইসলামে নেই।

আরও জেনে রাখা দরকার যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসরণ হলো কথা ও কাজে তাঁর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা। যা থেকে বারণ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা। অতএব যে ব্যক্তি

এর চেয়ে বেশী করবে বা কম করবে সে রাসূলের অনুসরণে ক্রটি করল। কিন্তু বাড়িয়ে কোনো কাজ করা অতি জঘন্য কাজ। কেননা এ কাজের দ্বারা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হয়ে যায়। (যা শরীয়তে স্পষ্ট হারাম) তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি যা মুসলিম ছাড়াও সব বিবেকবান লোক বুঝতে পারে। পরিপূর্ণ মু'মিনের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যেসব বিধান শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলো আমল করবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক যা শরীয়তসম্মত তা থেকে বাড়ানোই হলো অপূর্ণতা।

মু'মিনের উচিত আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক নতুন কিছু সংযোগ করা থেকে বিরত থাকা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ থেকে কড়াভাবে নিষেধ করেছেন। জুম্মার খুতবায়ে এটি তিনি ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"অতঃপর উত্তম হাদীস (কথা) হলো আল্লাহর কিতাব, আর উত্তম হিদায়েত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েত, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত (নতুন আবিষ্কার) করা, আর সব বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা।" সহীহ মুসলিমে এভাবে

বর্ণিত হয়েছে[1]। আর নাসাঈর বর্ণনায় আছে, “সব ভ্রষ্টতা যাবে জাহান্নামে”[2]।

আমি আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ়পদ রাখেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ফিতনা থেকে তিনি যেন আমাদেরকে মুক্ত রাখেন, অবশ্যই তিনি অতি দানশীন ও দয়াবান।

আমি “সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা” শীর্ষক এ আলোচনা মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হল রুমে বৃহস্পতিবার রাতে ৯/৭/১৪১৯ হিজরী তারিখে করেছি। আলোচনার সময় হয়ত কিছু বেশী বা কম করেছি।

লেখক:

মুহাম্মদ সালিহ আল-‘উসাইমীন

১৩/৭/১৪১৯ হিজরী।

---

[1] মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৭।

[2] নাসাঈ, কিতাবু সালাতিল ঈদাইন, বাবু কাইফাল খুৎবা, হাদীস নং (১৫৭৮); ইবন মাজাহ, আল-মুকাদ্দামাহ, বাবু ইজতিনাবিল বিদা‘ ওয়াল জাদাল, নং (৪৬)।

প্রশ্ন-উত্তর

বিসলিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত পিতা শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-‘উসাইমীনকে তাঁর মহামূল্যবান আলোচনার জন্য আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ তার ও তার ইলমের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমকে উপকৃত করুন।

বাস্তবে আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন এসেছে। শাইখের সময় অনুপাতে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর তার কাছে আশা করব। বাকী প্রশ্ন সম্মানিত পিতা অন্য কোনো আলোচনায় সময় পেলে হয়ত উত্তর দিবেন।

প্রথম প্রশ্ন: হে সম্মানিত শাইখ! আমি এক মসজিদের ইমাম; কিন্তু আমি সে মসজিদে নামায পড়ি না। আমার অপারগতা হলো: আমার দায়িত্ব খুবই কষ্টকর, আর মসজিদটি আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে। সুতরাং আমি যে বেতন নেই তার হুকুম কি? প্রকাশ থাকে যে, আমাদের এখানে অনেকেই আছে যারা আমার মত এ কাজ করে থাকে। আমার ও আমার মত অন্যান্যদের জন্য আপনার উপদেশ কি?

জবাব: আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। কিছু মানুষ মসজিদে সরকারী ইমাম বা মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব নেয়, কিন্তু ঠিক মত সে দায়িত্ব পালন করে না, অথচ

নিয়মিত বেতন ভোগ করেন। অন্য কাউকে অর্ধেক বা এর চেয়ে কম বেতন দিয়ে এ কাজ চালিয়ে যান।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. "আল ইখতিয়ারাত" এ "ওয়াকফ" অধ্যয়ে উল্লেখ করেছেন, এ ধরণের কাজ অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ। সে নিজে একই কাজে অধিক বেতন ভোগ করেন, অথচ অন্যকে তার চেয়ে কম দিয়ে এ কাজ চালিয়ে যান। শাইখ রহ. সঠিক কথাই বলেছেন।

আর যদি জামাত তরক করে এবং তার পক্ষ্য থেকে অন্য কেউ জামাত কায়েম না করে তবে তা আরো জঘন্য কাজ। সে নামায না পড়ালে তার জন্য উক্ত মসজিদের ইমাম হওয়া জায়েয নেই। অন্য কেউ ইমামতির দায়িত্ব নিবে।

এ প্রসঙ্গে আরো বলছি: যে সব চাকুরীজিবিরা কর্মস্থলে আসতে বিলম্ব করে বা অনুপস্থিত থাকে, অথচ হাজিরা খাতায় সঠিক সময় উল্লেখ করে, বা সময় শেষ হওয়ার আগে অফিস থেকে বের হয়ে যায়, তাদের এ ধরণের কাজ করা হারাম, এটা আমানতের পরিপন্থী।

আমরা যদি ধরি যে, সাপ্তাহিক উপস্থিতির পরিমাণ হলো ৩৫ ঘণ্টা, কিন্তু সে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে বিলম্ব করল, ফলে ৩৫ ঘণ্টা থেকে ৫ ঘণ্টা কমে গেল। তাহলে কিভাবে তার পূর্ণ বেতন নেয়া জায়েয হবে? ঠিক একই ব্যক্তিকে যদি তার নির্ধারিত ১০০ টাকা

বেতন থেকে কিছু টাকা কর্তন করে রাখলে সে কি তা চাইবে না? তাহলে কেন তার কাছ থেকে ওয়াদাপূরণ ও নিয়মানুবর্তিতা চাওয়া হবে না? একথা সকলেই জানে যে, কেউ সময়মত উপস্থিত ও প্রস্থানের অভ্যাস গড়ে তুললে এটা তার জন্য কঠিন নয়। কিন্তু নিজেকে অলস হিসেবে গড়ে তুললে তার জন্য অর্পিত দায়িত্ব পালন করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»

“মজবুত ঈমানদান আল্লাহর নিকট দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়। অবশ্য প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তোমার পক্ষে যা উপকারী ও কল্যাণকর, সে ব্যাপারে আগ্রহী হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করো। হিম্মতহারা হয়ো না, কোনো বিপদে পড়লে এরূপ বলো না, যদি এটা করতাম তাহলে এরূপ হতো (বা হতো না)। বরং এ কথা বলো: আল্লাহর তাকদীরে এটাই ছিল। তিনি

যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। কারণ “যদি” শব্দ শয়তানের কাজ উন্মুক্ত করে দেয়”।[1]

আল-কুরআনে এসেছে:

﴿ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦ ﴾ [القصص: ٢٦]

“নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত।” [সূরা আল-কাসাস: ২৬]

যে ব্যক্তি কাজে না গিয়ে বিছানায় এক বা দু’ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তার আমানতদারিতা কোথায়? প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব হলো, সে নিজের হিসেব নিজে নিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: তাওয়াফকারী যদি তাওয়াফ অবস্থায় অপবিত্র হয় এবং সে তার উমরার তাওয়াফ চালিয়ে যায়, তাহলে তার উমরা কি সহীহ হবে?

জবাব: আলেমদের কেউ কেউ পবিত্রতাকে তাওয়াফ সহীহ হওয়ার শর্ত বলেছেন। তাদের মতে উক্ত ব্যক্তির উমরা সহীহ হয়নি। তাই তবে সে ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। সুতরাং (যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ইহরাম অবস্থায় আছে তাই যদি সে অপবিত্র অবস্থায় উমরা করে ইহরামের কাপড় খুলে সাধারণ পোষাক

---

[1] মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৪।

পরেছে এবং মক্কার বাইরে চলে এসেছে, তাই) তার উচিত হবে পরিধানের কাপড় খুলে ফেলবে এবং ইহরামের কাপড় পড়বে। আবার মক্কা যাবে, অতঃপর তাওয়াফ, সায়ী’, চুল হলক বা কসর করবে।

আবার আলেমগণের কেউ কেউ বলেছেন, পবিত্রতা তাওয়াফের জন্য শর্ত নয়। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. এ মতকে গ্রহণ করেছেন। এ মতের ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তির উমরা সহীহ হবে; কেননা তার তাওয়াফ সহীহ হয়েছে, আর যার তাওয়াফ সহীহ তার উমরা পূর্ণ হয়ে গেছে।

তৃতীয় প্রশ্ন: কোনো কোনো মুসলিম দেশে প্রচলন আছে যে, আশাপূরণ যেমন: পদোন্নতি লাভ, চাকরী পাওয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে কুরআন খতম করা হয়। এর হুকুম কি? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এ সম্পর্কে বলুন। আল্লাহ আপনাদেরকে বরকত দিন।

জবাব: প্রকাশ থাকে যে, আল-কুরআন হল মহান আল্লাহর কালাম। যে ব্যক্তি তা তিলাওয়াত করবে তার প্রতি হরফে দশ নেকী বা ততোধিক সাওয়াব হবে। আর যে জিনিস দ্বারা আখেরাতের সাওয়াবের প্রত্যাশা করা হয়, তা দ্বারা দুনিয়ার প্রতিদান আশা করা যায় না। অতঃপর যারা বলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত চাকুরী লাভ বা ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদির অসীলা?!

কুরআন সব রোগের ঔষধ, অন্তরের রোগের ঔষধ। শারীরিক রোগেরও ঔষধ। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত রিজিকের অসীলা এ ব্যাপারে কোনো দলিল আছে? রিজিকের অসীলা হলো তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। যেমন: আল্লাহ তা‘আলা বলেছনে,

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ ۝٣ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

“যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না”। [সূরা আত-তালাক: ২-৩]

অতএব আমরা বলব, যারা কুরআন তিলাওয়াতকে দলিল ছাড়াই রিজিকের অসীলা বানিয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করব: আপনাদের দলিল কোথায়? আল্লাহ ভীতি রিজিকের অসীলা, এটা সত্য। কেননা আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ ۝٣ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

“যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না”। [সূরা আত-তালাক: ২-৩]

চতুর্থ প্রশ্ন: কিছু লোক বলেন যে, অধিকাংশ মানুষের আমল সে কাজটি সহীহ হওয়ার দলিল। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন: "عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ" **“তোমরা অধিকাংশ মানুষের জামাতের অনুসরণ করো।” এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?**

জবাব: তাদের এ দলিল সহীহ নয়; কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴿٥٩﴾ ﴾ [النساء: ٥٩]

“অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও” [সূরা নিসা: ৫৯] এখানে বিরোধ দেখা দিলে কার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলেছে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে। কুরআনে একথা বলা হয়নি যে, “অধিকাংশ লোকের দিকে প্রত্যার্পণ করাও”। এখানে সংসদে ভোট বা এরূপ কোনো বিষয়ের ব্যাপার নয়; বরং আমাদের দলিল হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। আমাদের জন্য ফরয হলো, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নহের দলিল দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় সেদিকে প্রত্যার্পণ করা, যদিও সে মতের উপর একজন মাত্র লোক পাওয়া যায়।

"عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ"

আর উক্তিটি যদি প্রমাণিত হাদীস হয়, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, “সত্য অনুসারী অধিকাংশ মুসলিমের জামাত” কেননা الأعظم দ্বারা শুধু অধিকাংশ বুঝায় না; বরং মর্যাদার বিচারে বড় বুঝায়। আর মর্যাদার বিচারে বড় তো তারাই যাদের কথা ও কাজ কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হয়। এ ব্যাখায় তখনই হবে যখন উক্ত উক্তিটি

সহীহ হাদীস হবে। আমার ধারণা এটা ইবন মাস‘উদ বা অন্য কারো বাণী।[1]

পঞ্চম প্রশ্ন: ব্যাংকে ইদা‘ (জমাকরণ) রাখার হুকুম কি?

জবাব: প্রয়োজনে ব্যাংকে ইদা‘ (আমানত জমা) রাখতে কোনো অসুবিধে নেই। কেননা কিছু মানুষ দলিল দেয় যে, ঘরে নিজের কাছে অর্থ রাখাটা বিপদজনক। ফলে নিরাপত্তার জন্য তারা ব্যাংকে জমা রাখে।

ব্যাংক যদি শুধু সুদ ভিত্তিকই লেনদেন করে তবে আমরা বলব, এ ধরণের ব্যাংকে কখনও অর্থ জমা রাখবেন না। কিন্তু সুদ ছাড়া অন্য কোনো খাতে জমা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার জমাকৃত অর্থ হালাল ও হারামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে এ ধরণের ক্ষেত্রে জমা রাখা জায়েয। কিন্তু এমতাবস্থায় বলব, যে সব ব্যাংক তুলনামূলক কম সুদের লেনদেন করে সে ব্যাংকে জমা রাখা উচিত।

এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সতর্ক করব: ব্যাংকে অর্থ জমা রাখাকে মানুষ ইদা‘ বা ‘আমানত’ বলে, কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা আলেমদের মতে, আল-ওয়াদিয়া হলো: “একজন অন্য কাউকে তার সম্পদ আমানত রাখতে দেয়া, সে উক্ত সম্পদ খরচ

[1] মুসনাদে আহমদ: ৪/২৭৮।

করবেনা”, পক্ষান্তরে ব্যাংকে সম্পদ রাখা হলো: “ব্যাংকের লকারে সম্পদ জমা রাখা এবং ব্যাংক বেচাকেনার কাজে উক্ত সম্পদ খরচ করবে”। এটাকে উলামা কিরাম করজ বা ঋণ বলে। এজন্যেই ফিকহের কিতাবে এভাবে নস এসেছে, কেউ যদি অন্য কারো কাছে তার সম্পদ জমা রাখে, অতঃপর সে উক্ত মাল খরচের অনুমতি দেয় তবে তা অদীয়া‘ থেকে কর্জে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অদীয়া‘ আর কর্জের মধ্যে পার্থক্য হলো, আমানতকারীর অবহেলা ব্যতীত অদীয়া‘ নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কিন্তু কর্জের ক্ষেত্রে সব অবস্থাতেই ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন: আমরা প্রায়ই একটি কায়েদা শুনে থাকি যে, “আমরা যে বিষয়ে একমত সে বিষয়গুলোতে ঐক্য থাকব”, আর “যে ব্যাপারে মতানৈক্য করব সে ব্যাপারে একে অপরের কাছে ওজর পেশ করব”। এ কথাটি কতটুকু সঠিক?

জবাব: আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশটি সহীহ, তা হলো “আমরা যে বিষয়ে একমত সে বিষয়গুলোতে ঐক্য থাকব”। আর দ্বিতীয় অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো:

আমরা যে বিষয়ে মতানৈক্য করব সেটি যদি এমন হয় যে, একপক্ষের নিকট সহীহ দলিল আছে, (অপর পক্ষের কাছে কোনো দলিল নাই) এবং এ মতানৈক্যটি ইজতিহাদি কোনো বিষয় নয়, সে ক্ষেত্রে বলব: যাদের কাছে দলিল নাই তাদেরকে ভুল না বলে বিরত

থাকব না। যেমন: কেউ যদি আক্বীদাগত বিষয়ে মতানৈক্য করে তবে আমরা চুপ থাকব না। কেননা, -আলহামদুলিল্লাহ- আক্বিদার মূলনীতিসমূহ জ্ঞাত, সালাফে সালেহীন এর মূলনীতির ব্যাপারে ঐক্যমত, অতএব, যারা এর বিরোধী হবে তাদের বিরোধিতা আমরা করব।

অপরদিকে, ইজতিহাদভিত্তিক ফিকহি মাস'আলাসমূহে উক্ত কথাটি ঠিক আছে। ইজতিহাদভিত্তিক মাসআলায় আমরা কারো বিরোধিতা করব না। কেননা বিরোধীকে প্রত্যাখ্যান করা মানেই হলো তুমি যা বলেছ তাই সঠিক এবং তোমার বিরোধী লোকের মতটি ভুল। অথচ তুমি যেটা বলেছ তাতে যেমন ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি অপরপক্ষেরও ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে।

অতঃপর, মানুষ যদি তার মতের উপরই অন্যকে চলতে বলে এবং অন্যের মতকে ভ্রান্ত বলে তবে সে নিজেকে রিসালাতের আসনে সমাসীন করল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শুধু নিষ্পাপ। আর তোমার বা অন্যের ইজতিহাদ ভুল ও সঠিক দুয়ের সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু সমস্যা হলো, কিছু লোক এ গ্রহণযোগ্য মতানৈক্য উপর তাদের সম্পর্কস্থাপন ও সম্পর্কচ্যুতি স্থাপন করে এবং মানুষের কাছে এটাকে নিন্দনীয় করে তোলে। অথচ মাসআলাটি এমন যে তাতে ইজতিহাদ তথা মত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। (যারা এ মতপার্থক্যের উপর

নির্ভর করে সম্পর্কচ্যুতি ও সম্পর্কস্থাপন করে থাকে) তাদের একাজটি ভুল। এটি সাহাবায়ে কিরামদের পন্থা নয়। সাহাবায়ে কিরাম –রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম- অনেক বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। এতদসত্বেও তারা কেউ কারো ব্যাপারে খারাপ (সমালোচনামূলক) কথা বলেননি, কাউকে পথভ্রষ্টও বলেন নি। উপস্থিত অধিকাংশের নিকটই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাবের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সাহাবাদের মতানৈক্যের ঘটনাটি অজানা নয়। বনী কুরাইযার ইয়াহূদীরা আহযাবে অংশগ্রহণকারীদের একদল, কিন্তু তারা অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছিল। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরীল এসে তাঁকে বনী কুরাইযা গোত্রের অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বনী কুরাইযা গোত্রের অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন, এবং তিনি তাদেরকে বললেন:

«لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»

“তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় না গিয়ে আসরের নামায আদায় না করে”।[1] ফলে তারা সকলে বের হলো এবং পথে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হলো। তাদের একদল বলল: আমরা নামায আদায় করে নিবো, যাতে ওয়াক্ত শেষ হয়ে না যায়।

---

[1] বুখারী, হাদীস নং ৯৪৬।

আরেকদল বলল: আমরা এখন নামায পড়বো না, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»

“তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় না গিয়ে আসরের নামায আদায় না করে”। ফলে একদল নামায পড়লো এবং অন্যদল বিলম্ব করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেননি এবং তিরস্কার করেননি। তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য করেননি এবং অন্যকে কেউ পথভ্রষ্টও বলেননি।

অতএব, ইজতিহাদভিত্তিক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে মানুষ অন্যকে তার মতের উপর চালানো জায়েয নয়। সে এ কাজ করা মানে নিজেকে রাসূল দাবী করা। তবে ইজতিহাদ নির্ভর নয় –বিশেষ করে আক্বিদাগত- এমন মাস’আলার ক্ষেত্রে অন্যের ভুল মেনে নেওয়া জায়েয নয়।

সপ্তম প্রশ্ন: আল্লাহর নাম "الشكور" **আশ-শাকুর কে** "الغفور" **আল-গাফুর দিয়ে তাফসির করা কি জায়েয? এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য কি? এবং** الرحمة **আর-রহমাহ কে** إرادة الإحسان **ইহসানের ইরাদা করা দ্বারা তাফসির করা জায়েয?**

জবাব: এটি জায়েয নেই। আল্লাহর নাম "الشكور" আশ-শাকুর কে "الغفور" আল-গাফুর দিয়ে তাফসির করা জায়েয নেই। কেননা

"الشكور" আশ-শাকুর অর্থ হলো যিনি প্রশংসিত কাজের বিনিময়ে কাউকে প্রতিদান দান করেন। আর "الغفور" আল-গাফুর অর্থ হলো বান্দার গুনাহ গোপনকারী। দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, যে তার অনুগত্য করে তিনি তাকে বিনিময় দান করেন। আর গফুর হলো যে তার অবাধ্য তিনি তাকেও ক্ষমা করেন। অতএব, একটিকে অন্যটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা জায়েয নয়। কেননা দুয়ের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান।

আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ الرحمة **আর-রহমাহ কে** إرادة الإحسان **'ইহসানের ইরাদা বা ইচ্ছা করা' দ্বারা তাফসির করা জায়েয? বস্তুত:** الرحمة আর-রাহমাহ অর্থের সাথে আশ-শাকুর ও "الغفور" আল-গাফুর এর মাসআলার কোনো সম্পর্কে নেই। কেননা الرحمة আর-রহমাহ অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য নিয়ামত বয়ে আনা ও তাদের থেকে অকল্যাণ দূরে রাখার মাধ্যমে দয়া করেন।

الرحمة আর-রহমাহ এর তাফসির إرادة الإحسان ইহসানের ইচ্ছা পোষণ করা, এটা ভুল ব্যাখ্যা। কেননা ইহসানের ইচ্ছা করা রহমতের আবশ্যক বিষয়, কিন্তু এটা স্বয়ং রহমত নয়। আর-রহমাহ আল্লাহর যাতী বা সত্ত্বাগত গুণ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া করেন। তাঁর রহমতের প্রতিক্রিয়া ও ফল হলো: সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের ইচ্ছা পোষণ করা।

তাই الرحمة আর-রহমাহ (দয়া) এর তাফসির إرادة الإحسان **(**ইহসানের ইচ্ছা পোষণ করা) দ্বারা করা জায়েয নেই। এমনকি ইহসান দ্বারাও রহমতের ব্যাখ্যা করা জায়েয নেই। কেননা এগুলো রহমতকে আবশ্যককারী বিষয়, স্বয়ং রহমত নয়।

অষ্টম প্রশ্ন: পুরুষ জীব জন্তুর বীর্য ক্রয় করে স্ত্রী জন্তুর মাঝে প্রবেশ করিয়ে জন্ম দেয়ানো জায়েয আছে?

জবাব: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে পাল দেওয়া বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।”[1]

উপরিউক্ত কাজটি একই ধরণের, বরং নিষেধের ক্ষেত্রে এর চেয়েও জঘন্য। কেননা পশুকে পাল দিলে মর্দার ক্ষতি হতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি হয়না। যারা মুসলিম নয় তাদের এ ধরণের কাজ কোনো ধর্তব্য নয়। কেননা তাদের এ সব কাজে কোনো কিছু আসে যায় না। পশু পালের মত এ ধরণের কাজও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

এর চেয়েও মারাত্মক হলো: যাদের ভ্রুণ থেকে সন্তান জন্ম নেয় না তাদের জন্য অন্য পুরুষ থেকে বীর্য নিয়ে নারীর গর্ভে দিয়ে সন্তান

---

[1] বুখারী, ২২৮৪, মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬৫।

নেয়া আরো মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহর কাছে আমরা এ কাজ থেকে পানাহ চাই।

নবম প্রশ্ন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী "إن اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" এর সালফে সালেহীনদের সঠিক ব্যাখ্যা কি? দয়া করে জানাবেন, আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

জবাব: প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটির জন্য নয়, বরং আমাদের জন্য ফরয হলো: আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যেভাবে এসেছে সেভাবেই ঈমান আনা। আমরা একথা জিজ্ঞেস করব না: কিভাবে? কেন? কেননা এ সব গায়েবী বিষয়ে প্রশ্ন করা ও গভীরে প্রবেশ করা কখনো কখনো মানুষকে ধ্বংস করে, ফলে সে এ সবকে অস্বীকার করে বা একটা রূপ দিতে চেষ্টা করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী "إن اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" "আল্লাহ আদম আলাইহি সালামকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন" অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» "আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন"[1] এ শব্দ বুখারীতে এসেছে। সাহাবা কিরামগণ কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেছেন নাকি তারা এগুলোকে গ্রহণ করেছেন ও আত্মসমর্পণ করেছেন?

[1] বুখারী, হাদীস নং ৬২২৭।

জবাবে বলব, তারা নিশ্চয় দ্বিতীয়টি করেছেন অর্থাৎ তারা এগুলোকে কবুল করেছেন। আমরা একথা জানি না যে, কোনো সাহাবা বলেছে: “হে আল্লাহর রাসূল সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য কি”? বরং তারা কোনো প্রশ্ন না করে কবুল করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা একটি মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছেন, সেটা হলো: আল্লাহকে কোনো কিছুর মত মনে না করা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর (আল্লাহর) মত কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা: ১১]

এমনকি যদিও আমরা কোনো সূরত বা রূপের কথা বলি তবুও একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, তিনি মাখলুকের রূপের সাথে সামঞ্জস্য রাখেন না। আর আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসসালামের আকৃতি আল্লাহর আকৃতির সদৃশ নয়।

তোমরা লক্ষ্য করেছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ»

“প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় হবে”[1]

[1] বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩৪।

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরিউক্ত বাণী দ্বারা কি সদৃশ অত্যাবশ্যক করে? আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তবে নিম্নোক্ত আয়াতে হাকীমের দ্বারা প্রমাণিত যে তা কোনো সদৃশ ছাড়া:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١ ﴾ [الشورى: ١١]

"তাঁর (আল্লাহর) মত কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১]

কিছু সালাফ উলামায়ে কিরাম বলেছেন: এখানে আকৃতি বলতে বুঝানো হয়েছে: আল্লাহ তা'আলা এ সূরত বা রূপটি সর্বোত্তম অবয়বে পছন্দ করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে আকৃতি দান করেছেন এবং পুনর্বিন্যাস করেছেন। অতএব আল্লাহ যে আকৃতিকে নিজে যথাযথ তত্ত্বাবধান করেছেন তাকে অসুন্দর গালি দেওয়া বা তাকে আঘাত করা সমীচিন নয়।

তবে প্রথম মতটিই বেশী নিরাপদ। কেননা দ্বিতীয় মতে তা'বীল বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অতএব আমরা একথা গ্রহণ করব যে, আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তবে কোনো সদৃশ ব্যতীত।

দশম প্রশ্ন: কতিপয় বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বলেন যে, কুরআনের মাজায না থাকার সবচেয়ে বড় দলিল হলো: মাজাযের নফী করা জায়েয। কিন্তু কুরআনে এমন কিছু নাই যা নফী করা যায়।

আমার কাছে আর একটি বিষয় খটকা লাগে যে, কুরআনে অনেক খবর বা সংবাদ আছে, আর খবর বলা হয় যার বাহককে সত্যবাদি বা মিথ্যাবাদি বলা যায়। অথচ কুরআনে এমন কিছু নেই যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায়। দয়া করে জানাবেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

জবাব: খবরের ব্যাখ্যায় উলামা কিরামদের কথার অর্থ হলো: সংবাদদাতাকে একথা বলা যাবে যে, সে সত্যবাদি বা মিথ্যাবাদি, তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো, খবরদাতার দিকে না তাকিয়ে স্বয়ং খবরটা। অর্থাৎ সংবাদদাতার দিকে বিবেচনা না করে শুধু সংবাদকে বিবেচনা করেই তা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ খবরপ্রদানকারীর ব্যাপারে এটা বলা যাবে না যে, সে সত্যবাদি কিংবা মিথ্যাবাদি। সংবাদের দিক থেকে; এর সংবাদদাতার হিসেবে নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত খবরের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, এতে মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে মুসাইলামাতুল কাযযাব, যে নিজেকে নবী দাবী করেছিল তাঁর কথাকে বলা যাবে না যে, এতে সত্যের সম্ভাবনা রয়েছে।

আর কুরআনে বা অন্য ক্ষেত্রে মাজাযের ব্যাপারে বলব: এটা আলেমগণের মতানৈক্যের স্থান। এ ব্যাপারে তাদের অনেক মতবিরোধ আছে। তবে আমাদের একথা জানা উচিত যে, শব্দের নানা অর্থ আছে। সিয়াক্ব তথা কথার পূর্বাপর ধরণই অর্থ নির্ধারণ

করে। একটি শব্দ এক স্থানে এক অর্থ প্রদান করে, কিন্তু সেটি আবার পূর্বাপর ধরণের কারণে অন্যত্র আরেক অর্থ প্রদান করে। যখন আমরা বলব: এটা শব্দের হাক্বিকত তথা মূল অর্থ, তখন আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কেননা কুরআনে বর্ণিত ٱلْقَرْيَةِ আল-ক্বারইয়া শব্দটি গ্রামের অধিবাসী ও জনপদ দু অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অতএব, আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ ٣١ ﴾ [العنكبوت: ٣١]

“নিশ্চয় আমরা এ জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব”, [সূরা ‘আনকাবূত: ৩১] এখানে ٱلْقَرْيَةِ দ্বারা জনপদকে বুঝানো হয়েছে। আবার কুরআনে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে:

﴿ وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ٨٢ ﴾ [يوسف: ٨٢]

‘আর যে জনপদে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞাসা করুন” [সূরা ইউসূফ: ৮২] এখানে ٱلْقَرْيَةِ দ্বারা জনপদের অধিবাসীকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং দেখুন একই শব্দ এক স্থানে অর্থ হলো জনপদ, আর অন্য স্থানে অর্থ হলো অধিবাসী।

কোনো বিবেকবানের পক্ষে একথা বলা সমীচীন হবে না যে, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানেরা তাদের পিতার সাথে কথা:

﴿ وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ٨٢ ﴾ [يوسف: ٨٢]

“আর যে জনপদে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞাসা করুন” [সূরা ইউসূফ: ৮২] এখানে ٱلۡقَرۡيَةَ দ্বারা একথা বুঝানো সম্ভব নয় যে, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জনপদে গিয়ে সেখানকার দেয়ালের কাছে জিজ্ঞেস করবে, এটা কখনও উদ্দেশ্য হতে পারে না।

ইবন তাইমিয়া রহ. এর মত হচ্ছে যে, আরবি ভাষা ও কুরআনে মাজায নেই। কেননা শব্দের অর্থ তার সিয়াক্ব তথা পূর্বাপর ধরণ বুঝে অর্থ নির্ধারিত হয়। যখন পূর্বাপর ধরণ (সিয়াক্ব) দ্বারা অর্থ নির্ধারিত হবে তখন হাক্বিকতই উদ্দেশ্য হবে, ফলে আর কোনো দ্বিধা থাকে না।

যারা বলেন যে, কুরআনে মাজায আছে তারা নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী দ্বারা দলিল দেন,

﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٧]

“অতঃপর তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।” [সূরা আল-কাহফ: ৭৭]

তারা বলেন, ইরাদা শুধু যাদের অনুভূতি আছে তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। দেয়ালের কোনো অনুভূতি নেই। এটা তাদের মত।

কিন্তু আমরা বলব: দেয়ালের ইরাদা আছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়কে বলেছেন:

«هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»

“এ পাহাড়টি আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।”[1] মুহাব্বত ইরাদার চেয়েও খাস বা বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং কে বলবে দেয়ালের ইচ্ছাশক্তি নাই, অথচ আল্লাহ বলেছেন,

﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴿٧٧﴾ ﴾ [الكهف: ٧٧]

“সেটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।” [সূরা আল-কাহফ: ৭৭], হ্যাঁ কিছু লোক শুধু তাদের নিজেদের বুঝ অনুযায়ী সেটা বলতে পারেন। তারা বলেন, ইরাদা শুধু যাদের অনুভূতি আছে তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। অথচ হাদীসে এসেছে,

«هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»

“এ পাহাড়টি আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।” এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, পাহাড়ের ভালবাসা আছে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন: কিভাবে বুঝব যে, দেয়ালের পড়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তবে আমরা বলব: সেটি হেলে যাওয়া বা ফেটে যাওয়ার দ্বারা বুঝা যাবে যে দেয়ালের ইচ্ছা শক্তি আছে।

একাদশ প্রশ্ন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত ও অভ্যাসগত কাজ এবং যে সব কাজ আমাদেরকে অনুসরণ করতে অত্যাবশ্যক করেছেন এর মধ্যে পার্থক্য আছে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

---

[1] বুখারী, হাদীস নং ১৪৮১।

জবাব: প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলহামদুলিল্লাহ, উসূলে ফিকহবিদগণ এ প্রশ্নের উত্তর পরিপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন।

সে সব কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবজাত যা শারীরিক চাহিদার কারণে করেছিলেন, যেমন: রাসূলের ঘুম, এটা কি জন্মগত বা স্বভাবজাত নাকি ইবাদতগত নাকি অভ্যাসগত? উত্তরে বলব, এ ধরণের কাজ স্বভাবজাত। তাঁর পিপাসা, পিপাসা পেলে পানি পান করা, ক্ষুধায় খাবার গ্রহণ করা ইত্যাদি কাজ তাঁর স্বভাবগত চাহিদা।

তাঁর কাপড়, চাদর ও পাগড়ি পরিধান হলো অভ্যাসগত কাজ। মাথায় চুল রাখা কি অভ্যাসগত নাকি ইবাদত সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে অধিক বিশুদ্ধ কথা হলো এটা তাঁর অভ্যাসগত কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সব কাজ ইবাদতের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল সেগুলো ইবাদতগত। এটা জানা যাবে যখন এ কাজগুলো মানুষের স্বভাব বা অভ্যাস করতে চায় না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজের মূল হলো তা‘য়াব্বুদী বা ইবাদতগত হওয়া।

দ্বাদশ প্রশ্ন: সালফে সালেহীনদের মানহাজ তথা পথ দ্বারা কি বুঝায়? এ পথের অনুসারীদের আলামত কি? এ পথেই চলতে হবে?

জবাব: সালফে সালেহীনদের মানহাজ তথা পথ দ্বারা বুঝায় আক্বিদা, ইবাদত, লেনদেন ইত্যাদি কাজে তাদের পথে চলা। এটা অনেক ব্যাপক অর্থের বাক্য।

সব মাসআলায় আমরা একথা বলতে পারি যে, এটা সালফে সালেহীনদের মানহাজ তথা পথ বা তাদের বিরোধীদের পথ। কিন্তু সালফে সালেহীনদের মানহাজ তথা পথ হলো: আক্বিদা, ইবাদত, লেনদেন ইত্যাদি কাজে তাদের পন্থা অনুসরণ করা।

এ পথের অনুসারীদের আলামত হলো: তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সব কাজে সালাফে সালেহীনের মত আখলাক বা চরিত্র অবলম্বন করবে আর তাদের পথের অনুসরণ করবে। যারা নিরাপদ থাকতে চায় তাদের উচিত সালাফের এ সুন্দর পথে চলা।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন: সুন্নাহকে সঠিকভাবে বুঝা ও সহিহভাবে সুন্নাহের উপর আমল করার পদ্ধতি কি?

জবাব: একথা জেনে রাখা দরকার যে, বুঝ বা জ্ঞান হলো মহান আল্লাহ তা'আলার এক মহা নিয়ামত। মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টায় এটা লাভ করতে পারেনা। এটা আল্লাহর দান। এজন্যই আবু জুহাইফা যখন আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে জিজ্ঞেস করছিলেন: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا

إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

তিনি বলেন, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কুরআনে যা কিছু আছে তা ছাড়া আপনাদের নিকট কোনো কিছু আছে কি? (অর্থাৎ খিলাফতের কোনো অসিয়ত কি এসেছে, যার কথা তখন খুব প্রসার করে বলা হচ্ছিল) তিনি বললেন: না, সে আল্লাহর কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম: এ সহীফাতে কি আছে? তিনি বললেন, 'দীয়াতের বিধান' এ ছাড়া দাস মুক্তকরণ এবং কোনো মুসলিমকে যেন কোনো কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয় (এ সম্পর্কিত বিধান)।"[1]

মানুষ জ্ঞানের বিচারে নানা রকম হয়ে থাকে। এজন্যই দেখবে উপরিউক্ত হাদীস থেকে কিছু আলেম দশটি হুকুম বের করেছেন, আবার কেউ এর চেয়েও অনেক বেশি বিধান ইজতিহাদ করে বের করেছেন। আবার কাউকে দেখবে সে কিছুই বের করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করব, এক লোক ইমাম আহমদ রহ. এর মাযহাবের কিতাব 'আল-ফুরূ'' কিতাব হিফয করেছে। এটি

[1] বুখারী, হাদীস নং ৩০৪৭।

অনেক বড় একটি কিতাব। কিন্তু সে কোনো মাস'আলারই হুকুম জানে না। তার সে জ্ঞান নেই। তার সঙ্গী সাথীরা তাকে উক্ত কিতাবের একটি কপি মনে করে সঙ্গে নিয়ে বের হতো, যখনই তাদের কাছে সন্দেহ হতো তখন তারা তাকে বলত, তুমি অমুক অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ পড়। সে পড়লে তারা সেখান থেকে হুকুম রেব করত। সুতরাং এ সব আল্লাহর দান, তিনি যাকে খুশী তাকে দান করেন।

কিন্তু জ্ঞানের কিছু আসবাব তথা অর্জনের উপায় আছে, তা হলো: কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবনকে গড়া, এতে গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করা, পূর্ববর্তী উলামাদের কিতাব বার বার পড়া।

চতুর্দশ প্রশ্ন: আছার তথা প্রাচীন নিদর্শন সম্পর্কে এক লোক জিজ্ঞেস করেছে। এর গুরুত্ব কি? এগুলো পরিদর্শন করার হুকুম কি? আল্লাহ আপনাদের সকলকে হিফাযত করুন।

জবাব: আমরা জানি যে, প্রাচীন নিদর্শন যদি উপকারী হয় তবে এতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এগুলোর পরিদর্শনকে যদি ইবাদতের অসীলা বানানো হয় এবং সে যদি বিশ্বাস করে যে, এর প্রভাব আছে, তবে এগুলো সরিয়ে ফেলা উচিত, বরং কখনও কখনও তা নিঃশেষ করে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কেননা আমিরুল মু'মিনিন 'উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে যখন খবর এলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গাছের তলায় 'বাই'আতে

রিদওয়ান’ করেছেন সে গাছটির উদ্দেশ্যে একদল লোক বের হতো। ফলে ‘উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উক্ত গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। আলহামদুলিল্লাহ গাছটি খলিফার নির্দেশে কর্তিত হয়। বর্তমান যুগে যদি গাছটি বিদ্যমান থাকত তাহলে কি ঘটত?! মানুষ ক্বাবায় হজ্ব না করে সে গাছটিকে হজ্ব করত। কেননা বাতিলের প্রতি মানুষের ঝোঁক খুব বেশী।

ঐতিহাসিক নিদর্শন দু’ধরণের:

প্রথম হলো: যে সব প্রাচীন নিদর্শনের কোনো ভিত্তি নেই সেগুলো ভেঙ্গে ফেলাই ভালো।

দ্বিতীয়: যে সব প্রাচীন নিদর্শনের ভিত্তি আছে, তখন দেখতে হবে শরিয়ত কি এগুলো যিয়ারত করতে নির্দেশ দিয়েছে? যদি নির্দেশ দেয় তবে ভালো, নতুবা উত্তম হলো নিঃশেষ করে দেয়া। **উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:** হেরা পর্বত, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহী নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এটি কি আরোহণ করে সম্মান প্রদর্শনের স্থান? উত্তরে বলব, না। কখনো না। যদি এটি সম্মান প্রদর্শনের জায়গা হতো তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম এ কাজটি করতেন। এভাবে সাওর পর্বতের ব্যাপারেও বলা যায়।

পঞ্চদশ প্রশ্ন: একজন জিজ্ঞেস করেছে, কাফির দেশে দাওয়াত দেওয়া কি মক্কা বা মদিনায় অবস্থান করার চেয়েও উত্তম?

জবাব: আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া হলো মানুষের সর্বোত্তম কাজ। কাফির দেশে দাওয়াত দেওয়াতে যদি ফলাফল ও প্রভাব পাওয়া যায় তবে মক্কা বা মদিনা অবস্থান না করে সেখানে দাওয়াতি কাজ করা উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতে মক্কা থেকে তায়েফে গিয়েছেন। সাহাবা কিরামগণ নানা দেশ বিজয় হলে মক্কা মদিনা ছেড়ে সেসব দেশে দাওয়াতি কাজে গিয়েছেন।
কিন্তু কাফির দেশে তার দাওয়াত দেওয়াতে যদি কোনো ফায়েদা না হয়, তবে সম্মানিত জায়গায় বসবাস করা উত্তম। এজন্যই উলামা কিরাম মতানৈক্য করেছেন, মক্কা নাকি মদিনায় বসবাস করা উত্তম? তাদের প্রত্যেকেরই দলিল আছে। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. এর মতে, “যেখানে বাস করলে তার ঈমান ও তাক্বওয়া বাড়বে সেখানে বাস করা উত্তম।”
এভাবেই আমরা আজকের আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম। আশা করি আমাদের এ মজলিস বরকময় হবে। আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে উপকারী ইলম ও আমলে সালেহ দান করুন। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সত্য পথের দা‘ঈ ও সাহায্যকারী বানান। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর।

সূচীপত্র

কিছু লোক বলেন যে, অধিকাংশ মানুষের আমল সে কাজটি সহীহ হওয়ার দলিল। কথাটি কতকুটু সহীহ?	
ব্যাংকে ইদা' (জমাকরণ) রাখার হুকুম কি?	
"আমরা যে বিষয়ে একমত সে বিষয়গুলোতে ঐক্যবদ্ধ থাকব", আর "যে ব্যাপারে মতানৈক্য করব সে ব্যাপারে একে অপরের কাছে ওজর পেশ করব" । এ কথাটি কতটুকু সঠিক?	
আল্লাহর নাম "الشكور" আশ-শাকুর কে "الغفور" আল-গাফুর দিয়ে তাফসির করা কি জায়েয?	
পুরুষ জীব জন্তুর বীর্য ক্রয় করে স্ত্রী জন্তুর মাঝে প্রবেশ করিয়ে জন্ম দেয়ানো জায়েয আছে?	
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী "إن اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" এর সালফে সালেহীনদের সঠিক ব্যাখ্যা কি?	
কুরআনের মাজায না থাকার দলিল	
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত ও অভ্যাসগত কাজ এবং যে সব কাজ আমাদেরকে অনুসরণ করতে অত্যাবশ্যক করেছেন সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য	
সালফে সালেহীনদের মানহাজ তথা পথ দ্বারা কি বুঝায়?	
সুন্নাহকে সঠিকভাবে বুঝা ও সহিহভাবে সুন্নহের উপর	